তেলেঙ্গানা সংগ্রামের শুরু

পি. সুন্দরাইয়া

তেলেঙ্গানা সংগ্রাম সম্পর্কে বলতে যাওয়ার আগে একটা সত্যি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অন্ধ্রে বেশ কিছু সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। চাল্লাপল্লী কৃষক সংগ্রাম তার অন্যতম। সব জায়গাতেই কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করার সাধারণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের সামনে প্রশ্ন আসে, জমিদারদের জমি আমরা দখল করে নেবো কিনা। কৃষক সংগ্রাম চালানোর পাশাপাশি এই ইস্যুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তেলেঙ্গানা এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম তীব্রতর করার পাশাপাশি নিজামশাহী উচ্ছেদের জন্য সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। এর আগে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম — একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হোক। এটা নিজামের তত্ত্বাবধানেই কাজ করবে। এই সরকারে মুসলিম ও অ- মুসলিমদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আমরা নতুন আওয়াজ তুললাম— 'নিজাম সরকার উচ্ছেদ কর। এই স্লোগানের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৫ সালে আমরা ব্যাপক অংশের জনগণকে সমবেত করতে সমর্থ হই। একটা শর্ত ছিলো— জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদের কোনও সুযোগ দেয়া চলবে না। আমরা দাবি জানালাম, চাষীদের হাতে জমির মালিকানা দিতে হবে, বেগার প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। ওই বছরে, অন্ধ্র মহাসভার সভ্যপদ বেড়ে দাঁড়ায় এক লক্ষেরও বেশি। নালগোন্ডা, ওয়ারবেঙ্গাল, খাম্মাম ও করিমনগরে মহাসভার শক্তিশালী গণভিত্তি ছিলো। দেশমুখদের আধিপত্য ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে বিশেষ করে দুর্নীতি ও বেগার প্রথার বিরুদ্ধে ওইসব জেলায় বহু সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। এই সংগ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছে অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে।

এ সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের উল্লেখযোগ্য বিকাশ

ঘটে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমরা কৃষক ও শ্রমিক সংগ্রামে নতুন দিশা দেওয়ার প্রশ্নে আলোচনা করি। তদ্দিনে সংগ্রামের প্রধান ফলক ভি রামচন্দ্র রেড্ডির বিরুদ্ধে কেন্দ্রিভূত হচ্ছিলো। কারণ, তিনি কৃষি শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের বিদ্রোহ দমাতে গুন্ডা লেলিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই তিনি নিজে ডি কোমরাইয়কে গুলি করে হত্যা করেন। এমন কি তারও আগে, কমরেড বি নরসিমা রেড্ডি ও কমরেড আরুটলা রামচন্দ্র রেড্ডিকে সংগ্রাম পরিচালনার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। আদালতে নেয়ার সময় আমাদের কিছু কমরেড হঠাৎ করে পুলিশভ্যানের পথ অবরোধ করেন এবং এই দু'জন কমরেডকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে আনেন। তাঁদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালানো হয়েছিলো। এই ঘটনার পর আমরা আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিই। কারণ শ্রেণিশত্রুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা না করতে পারলে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের সংগ্রাম আমরা এগিয়ে নিতে পারবো না। সুতরাং, পার্টির নেতা ও সংগ্রাম রক্ষায় কর্মীদের লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র বহন করার নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা জনগণের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে একটি বাহিনী-গঠন করলাম। তাদের হাতে লাঠি, গুলতি ইত্যাদি থাকবে। আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য কিছু অস্ত্রও আমাদের কাছে ছিলো।

ডি. কোমারাইয়া যখন গুলিবিদ্ধ হলেন, তখন আশপাশের গ্রামের স্কোয়াডগুলিকে আমরা জড়ো করি এবং সংগ্রামের নয়া কৌশল তাদের কাছে ব্যাখ্যা করি।

জনগণের বিরাট জমায়েত সংঘটিত হয় এবং ভি দেশমুখকে মানুষ তাড়া করেন। দেশমুখের ডাকবাংলোটি জনগণ বাস্তবে দখল করে নেন। বাংলোটির নাম ছিলো লাল গদি। অবশ্য, পুলিশ এসে এবং ঘটনায় হস্তক্ষেপ করায় ডাকবাংলোটির দখল আমাদের ছেড়ে দিতে হয়।

১৯৪৫-৪৬ সাল। সংগ্রাম চলছে। একটি রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতি আমরা লক্ষ্য রাখছিলাম। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে কংগ্রেসও মুসলিম লীগ ব্রিটিশের সাথে ম্যারাথন বৈঠক চালাচ্ছে। চুক্তির অংশ হিসেবে ঠিক হলো,

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। সুতরাং ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর পরই বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি ও রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রকাশম পাংতুলুর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা শপথ নেয়। কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ কমরেড কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিশাল আন্দোলন সংঘটিত করার অপরাধে তখনও জেলে বন্দি। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতারা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন কিন্তু বামপন্থী নেতারা জেলেই রইলো। তারপর ব্রিটিশ শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে অন্তর্বর্তী সময়ে আজাদহিন্দ ফৌজের সদস্যদের বিচার রদ করার দাবিতে আমরা সংগ্রাম সংগঠিত করে চলেছি। সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছিল রিং বিদ্রোহের সমর্থনেও। তবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা। গণপরিষদে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলীম লিগের মধ্যে বড় ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেয়। সেসব কাহিনী বিস্তৃতভাবে বলার দরকার নেই।

১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রকাশম মন্ত্রীসভা অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কেরালার কৃষক ও শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য এবং কমিউনিস্ট নেতাদের জেলে পুরার লক্ষ্যে একটি ভয়ঙ্কর অর্ডিন্যান্স জারি করে। সুতরাং আবারো আমাদের আত্মগোপনে চলে যেতে হয়। আমার যতটুকু মনে পড়ে, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে এবং কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভাগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কী হতে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই অর্ডিন্যান্সের জন্য প্রকাশম পাংতুলু একাই দায়ি কিনা এ ব্যাপারে পার্টিতে সাংঘাতিক বিতর্ক দেখা দেয়। নাকি আমলারা এই বিল তৈরি করেছে যা প্রকাশম শুধু সমর্থন করে যাচ্ছে। আমি এবং আমার মতো যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটা উপসংহারে পৌঁছবার জন্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাই। আমাদের মত ছিলো প্রকাশমের আগাম

অনুমোদন ছাড়াই অর্ডিন্যান্সের খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং সে কারণে প্রকাশমকেই এই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করতে হবে। এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টদের ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দিতে হবে। অবশ্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কমরেড আমাদের মত গ্রহণ করেননি। সে যায়ই হোক অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার হলো না এবং আমাদের আন্দোলনের ওপর প্রচন্ড নিপীড়ন চললো। ফলে আত্মগোপনে থাকার সময়কাল আমাদের বেড়ে গেলো।

একই সময়ে তেলেঙ্গানা সংগ্রাম এক অভূতপূর্ব ইতিবাচক মোড় নেয়। সেই সময় পর্যন্ত আন্দোলনে আমরা কোন অস্ত্র ব্যবহার করিনি। আমার মনে হয়, কোমারাইয়ার শহীদের মৃত্যুবরণ করার তিন চার মাস পরই কেবল কর্মীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো, যদিও তা ব্যাপক আকারে নয়। রাজ্যের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে কংগ্রেস ও নিজামের মধ্যে আলাপ- আলোচনা চলতে থাকায় আমরা আমাদের আন্দোলনকে একটু নরম ও সীমিতভাবে পরিচালনা করি। গোটা দেশে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে পার্টির মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন দেখা দেয়। এক লাইনের প্রবক্তা ছিলেন কমরেড পি সি যোশী, এবং অন্যটি ছিলো বি টি রনদিভে ও জি অধিকারীর সমর্থন-পুষ্ট।

অন্ধ্রে আমরা সংখ্যালঘু ছিলাম। সি রাজ্যেস্বর রাও এবং এম চন্দ্রমের প্রতি ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন। যোশীর লাইনের মূল কথা ছিলো কংগ্রেসের দেশপ্রেমিক অংশের সমর্থন নিয়ে আমাদের সংগ্রাম এগিয়ে নিতে হবে। আমাদরে সংগ্রামের অভিমুখ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়পুষ্ট সেকারণে কংগ্রেস দলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম চালানো জরুরি। প্রথমদিকে আমি যোশীর লাইনের অনুসারী ছিলাম। বি টি রনদিভের নেতৃত্বে পার্টির অন্য অংশের মতামত ছিলো যোশীর লাইন একটা শোধনবাদী লাইন ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম তীব্রতর করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। যদিও তিনি বিস্তৃতভাবে বলেননি যে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কৃষক ও শ্রমিকদের বহু সংগ্রাম ও অভ্যুত্থান

পার্টির পক্ষে এ লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার একটা সুবিধাজনক মুহূর্ত তৈরি করেছে। জনগণের মধ্যে একটা সাধারণ বিপ্লবী মনোভাব বিরাজ করছে। সুতরাং সাধারণ ধর্মঘটের পরিবর্তে তারা সশস্ত্র বিদ্রোহকেই পছন্দ করলেন। এখন আপনি যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন কোন লাইনটা সঠিক তাহলে আমি বলব দুটো লাইনই ভুল এবং ঐ সময়কার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। তখন সশস্ত্র বিদ্রোহ চালাবার মতো কোন অনুকূল পরিবেশ ছিল না। অন্যদিকে যোশীর যে ধারণা, কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে আমাদের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে ঐ দলের দক্ষিণপন্থী নেতাদের পরস্তা করার জন্য, এটাও একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ। কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ নিজের দলের দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার করার আদৌ কী আগ্রহ দেখিয়েছে?— তা তো নয়। সুতরাং বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চিন্তা থেকে আহ্ রনকৌশল ঠিক করার ব্যাপারটা পুরোপুরি ভুল। যাই হোক কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পি সি যোশীর লাইন গ্রহণ করলেন। এটা চললো ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত,যখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হলো।

ক্ষমতা হস্তান্তরের (১৫ আগস্ট) কয়েকদিন আগে আমরা প্রকাশ্যে এলাম। আমাদের সংগ্রাম অগ্রসর করার জন্য সব ধরনের সুযোগ গ্রহণে আমরা সচেষ্ট হই। মাদ্রাজের প্রকাশম সরকার ঘোষণা করলো, কমিউনিস্ট আন্দোলন বেআইনি ঘোষণা করে তিনি যে আধ্যাদেশটি জারি করেছিলেন তা আসলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরই তৈরি করা এবং এই খসড়ার বিরোধিতা করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের ছিল না। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে চারিদিকে তখন উৎসব চলছিলো। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস সরকারগুলি আমাদের ওপর নিপীড়ন চালানোর সাহস দেখায়নি। নতুন করে কোন গ্রেপ্তার হলো না, কিন্তু তারপরও ঝুঁকি নিতে আমরা তৈরি ছিলাম। বাস্তব ঘটনা হলো ১৫ আগস্টের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে আমরা হাজির ছিলাম। পার্টির কেন্দ্রীয় লাইন ছিলো ব্রিটিশরা যেহেতু চলে যাচ্ছে সুতরাং ভারতীয় পতাকার প্রতি আমাদের সম্মান জানানো উচিত। এই

বক্তব্যের আমি বিরোধিতা করলাম, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই লাইন গৃহীত হয়েছে। তেলেঙ্গানা ছাড়া অন্য সব জায়গায় আমরা পার্টির এই লাইন সমর্থন করলাম। কিন্তু তেলেঙ্গানায় সংগ্রাম জারি রাখা হলো। এর কারণও ছিল। নিজাম সরকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। যথাসময়ে নিজামশাহী ও দেশমুখদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম তীব্রতর হলো। এই পথ ছাড়তে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, যদিও কংগ্রেস ও তার নিজস্ব পদ্ধতিতে হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিজামের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলো।

কংগ্রেস একদিকে হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির বিষয়ে নিজামের সঙ্গে দর কষাকষি চালাচ্ছিলো, অন্যদিকে আমরা জমিদার ও নিজামের বিরুদ্ধে বড় ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হই। জমিদাররা কৃষক বিদ্রোহকে আর মোকাবেলা করতে পারছিলো না। তখন বিদ্রোহী জনগণের উপর নিজামের পুলিশ হামলে পড়লো। গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আমাদের প্রতিরোধশক্তি অবশ্য সমতুল ছিলো না। ইয়েল্লা রেড্ডি এবং অন্যরা কর্মীদের সশস্ত্র করতে ব্যাপক প্রয়াস চালাচ্ছিলেন, তবুও আমরা খুব একটা কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছিলাম না। অনেক জায়গায় সশস্ত্র পুলিশ আসার আগেই আমাদের স্কোয়াডকে হয় সরিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা প্রত্যাহার করতে হয়েছে। কারণ তা না হলে সশস্ত্র পুলিশরা ব্যাপক নির্যাতন চালাতে পারে। নিজামের পুলিশ রাতদিন আমাদের স্কোয়াডগুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছিলো। ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। এই আন্দোলন রক্ষার জন্য কার্যকরী প্রতিরক্ষা লাইন গড়া সম্ভব হয়নি।

সুতরাং আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সঙ্গে ডিনামাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ থাকবে। তবে এসব অস্ত্র শুধু আত্মরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হবে। এ উদ্যোগের পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন মিললো। কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন ছিলো এ কারণে যে, আত্মরক্ষার খাতিরে

এক জায়গায় এসব অস্ত্র ব্যবহার করলেও গোটা দেশে তার প্রভাব পড়বে। অস্ত্র তুলে নেয়ার অর্থ শুধু ডিনামাইট বা দেশি বন্দুক ব্যবহার করা নয়, শত্রুর হাত থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়াও এই রণকৌশলের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই সময় পর্যন্ত শত্রু বলতে বোঝাতো নিজামের পুলিশ ও জমিদারদের বাহিনী। প্রথমে নিরস্ত্র করতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নে আমরা সবাই একমত ছিলাম। পার্টি কেন্দ্র থেকেও আমাদের উদ্যোগের বিরোধিতা করা হয়নি। সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে জমিদার ও ধনী কৃষকদের জমি দখল করার প্রশ্নেও আমাদের মধ্যে সহমত তৈরি হয়। যদিও আগেও আমরা জমি দখল করেছি। এখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে এর উপর অতিরিক্ত জোর দেয়াটা ঠিক হবে না। তাতে নিজামশাহীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বেড়ে যাবে। সুতরাং সংগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই ইস্যুটি আপাতত স্থগিত রাখলাম। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের সমর্থকে পর্যবসিত হওয়ায় সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে জমির ইস্যুটি যুক্ত করা ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প পথ খোলা ছিলো না।

আমরা বহু সশস্ত্র স্কোয়াড গঠন করলাম এবং তেলেঙ্গানার বাইরে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তলেঙ্গানার প্রচন্ড নিপীড়ন চলতে থাকায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ ওখানে করা যায়নি। আমার ১৯৪২ - ৪৩ সালে স্কোয়াডের প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তেলেঙ্গানা সংগ্রামে কাজে লাগে। কোন্ডাপল্লী বনাঞ্চলেও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত ছিলো। বন্দুক চালানো, ডিনামাইট ফাটানো, বোমা বানানো ইত্যাদি প্রশিক্ষণের অঙ্গ ছিলো। প্রাথমিক কিছু সামরিক কায়দা- কৌশল ও তাদের শেখানো হয়। কী করে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালাতে হয় এসবও ট্রেনিং দেয়া হয়। মূলত, আঘাত করো ও সরে পড়ো এবং ডাকবাংলো, সশস্ত্র ছাউনি দখল করার নীতিই প্রাধান্য পায়। প্রশিক্ষণের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম না। তবে এই কর্মসূচীর দেখভালের দায়িত্ব আমার ওপর ছিলো। অন্যরা প্রত্যক্ষভাবে এ কাজের দায়িত্বে ছিলেন। এটা ছিলো প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং সশস্ত্র স্কোয়াডগুলি বাস্তব পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে নিজেরাই রণকৌশল ঠিক

করতো এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। স্কোয়াডগুলি সেই অর্থে আধুনিক ছিলো না। চিন্তার দিক থেকে যেমন নয়, তেমনি শারীরিক সক্ষমতার প্রশ্নেও এরা সামরিক অভিযান চালানোর জন্য উপযুক্ত ছিলো না। প্রাথমিকভাবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সামরিক কমান্ডের অধীন তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখাটা ছিলো কঠিন কাজ। তাদের অনেকে সশস্ত্র প্রতিরোধে নিজেদের সক্ষমতা জাহির করার জন্য এদিক- সেদিক গোলাগুলি ছুঁড়তো। অবশ্য, এসব ঘটনার সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিলো না।

প্রশিক্ষণ শেষ হলে পর গোটা তেলেঙ্গানা জুড়ে অভিযান উদ্দীপিত হয়। সাধারণভাবে গ্রামীণ এলাকা গেরিলা যুদ্ধের জন্য বেশি অনুকূল ছিলো। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম দিকে দুটো উপাদান আমাদের সাহায্য করে। প্রথমত, কংগ্রেসের দ্বারা সংগঠিত প্রতিটি গ্রাম ও শহরে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে আমরা যোগদান করেছি, একই সময়ে জনগণের ব্যাপক জমায়েত ঘটিয়ে আমরা লাল পতাকাও উত্তোলন করেছি। স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস নেতাদের এর বিরুদ্ধে ফলার সুযোগ ছিলো না। কারণ, তাদের জমায়েত হতো অল্প লোকের, আমাদের হতো বড়ো। অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষে এটাও প্রকাশ্যে বলা সম্ভব ছিলো না যে, নিজামশাহীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস লড়াই করতে রাজি নয়। এভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দিনে একই জায়গায় আমরা লাল পতাকাও উত্তোলন করেছি এভাবে নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সেখানে বড় শক্তি ছিলাম, ফলে আমাদের নেতৃত্বে আসতে সুবিধে হয়েছে। শক্তি কম হলে জনগণ আপনাকে অনুসরণ করবে না। সেই সময়ে তেলেঙ্গানায় আমরা প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছি এবং আমরা ভীষণভাবে সক্রিয়ও ছিলাম। সুতরাং জনগণ কংগ্রেসের চেয়ে বেশি সংখ্যায় আমাদের চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আমরা তালরসের তাড়ি খাওয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম সংগঠিত করেছি। তাড়ির দোকানের সামনে ধর্ণা দিয়েছি। এভাবে তাড়ি থেকে সরকারের ট্যাক্স আদায় কমানোর চেষ্টা করেছি। পরে অবশ্য টডি- টেপারদের জীবিকার

কথা ভেবে আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়। সব অংশের মানুষকে এই আন্দোলনে সমবেত করা সম্ভব হয়েছিলো। এটা প্রকৃতই একটা গণসংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিলো। নিজামশাহী জনগণের প্রতিরোধ আর সহ্য করতে রাজি ছিলেন না এবং নিজামের সেনা দল জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম দমনের কাজে নিয়োজিত হয়।

নিজামের সশস্ত্র পুলিশের পক্ষে আর সম্ভব ছিলো না, প্রকাশ্যে গ্রামে গ্রামে চিরুনি অভিযান চালানো। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দল অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা সীমান্তে নিজেদের সরিয়ে নেয় এবং কংগ্রেসের ভেতরে কমিউনিস্টদের বিশেষ করে সশস্ত্র সদস্যদের দল থেকে বিতাড়িত করতে শুরু করে। কংগ্রেস গ্রামগুলো থেকে দূরে অবস্থান করে, যাতে নিজামের নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র স্কোয়াডগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রথমদিকে এই সীমান্ত এলাকাকে আমরা পিছুহটার জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। যাই- হোক, সশস্ত্র দলগুলোকে আত্মরক্ষা করতে বলা হলো এবং প্রয়োজনে নিজামশাহীর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানার নির্দেশ দেয়া হলো। যখন জোরকদমে ওরা তল্লাশি চালাচ্ছিলো তখন সশস্ত্র স্কোয়াডগুলোকে নিজাম-বাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ দেয়া হয় তাদের বিচ্ছিন্ন ছাউনিগুলিকে দখল করার। কিছু এলাকায় শুল্ক আদায়ের চেকপোস্ট ছিলো। ওখানে সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকতো। এগুলোও দখল করে নিতে সশস্ত্র দলগুলিকে নির্দেশ পাঠানো হলো। এসব জায়গায় হামলা চালানোর মূল উদ্দেশ্য ছিলো হাতিয়ার সংগ্রহ করা। গেরিলা যুদ্ধে কাজে লাগুক আর না লাগুক এগুলো আমাদের দখলে আনা জরুরি। শত্রুর খবরাখবর সংগ্রহের জন্য আমাদেরও গোয়েন্দাবাহিনী ছিলো। এ কাজে তাদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। তারা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচলের ওপর নজর রাখতো। তা হলেও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে আমাদের প্রশিক্ষিত গেরিলা স্কোয়াডগুলি নিয়োজিত ছিলো। এগুলি ছিলো সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত স্কোয়াড।

সুতরাং নিজামের বাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে

আমরা সক্ষম হই। ১৯৪৭- ৪৮ সালের পুরো সময় এ লড়াই চলে। নিজামের বাহিনী আমাদের স্কোয়াডগুলো সম্পর্কে নিয়মিত খবর সংগ্রহ করতে পারতো না। ১৯৪৭ এর আগে আমরা অস্ত্র ধরি, যদিও সেটা ছিলো কেবল আত্মরক্ষার জন্য। নিজাম-বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ শুরু করার পর আমরাও প্রতি-আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করি। মাঝে মাঝে নিরাপত্তা পোস্টে অতর্কিতে হামলা চালানো হতো। আমাদের এই আক্রমণাত্মক অভিযান ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঠিক এ সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী তেলেঙ্গানা অঞ্চলের দখল নিতে শুরু করে। তার আগেই অবশ্য তেলেঙ্গানা অঞ্চলের ৩০০০ গ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন বিস্তৃত হয়। বাস্তবে, এসব গ্রাম থেকে জমিদাররা বিতাড়িত হয়। নিজামের পুলিশ ও প্রশাসন এসব গ্রামে ভেঙ্গে পড়ে। সশস্ত্র সংগ্রামের নেতারা গ্রামীণ প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পঞ্চায়েত তহবিলও তাদের হাতে চলে আসে। অবশ্য, আমাদের সংগ্রামের মতোই নিজামশাহীরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শক্ত জায়গা ছিলো। এগুলো ছিলো প্রধানত শহর এবং বড় বড় পঞ্চায়েতে। আমরা ওইসব স্থানেও সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়েছি যদিও সেগুলো ছিলো প্রতীকি প্রতিরোধ।

১৯৪৭সালের আগস্ট- ডিসেম্বর, এই চার মাস সময়ের আমর সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হই। অন্ধ্রে আমাদের একটি আইনি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তেলেঙ্গানায় যখন শত্রুতর অভূতপূর্ব আক্রমণ চলতো তখন আমাদের স্কোয়াডগুলি শ্বাস নেওয়া ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য প্রজাশক্তি নগরে (বিজয়ওয়াড়া) আসতো। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালের ভয়ঙ্কর আক্রমণের সময়ে এটা ঘটেছিলো নিজামের বিরুদ্ধে, এমনকি কংগ্রেসের লোকেরাও আমাদের এই সংগ্রামকে সমর্থন করতো। কে মধুসূধন রাও এবং অন্যরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার জন্য আমাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। বিজয়ওড়ার কিছু ব্যক্তির কাছ থেকেও আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম। তাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সেদিক তেকে জনগণের প্রভূত সাড়া পরিলক্ষিত হয়। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা ৩০,০০০- ৪০,০০০ টাকা সংগ্রহ করে ফেললাম। দেশপ্রেমিক

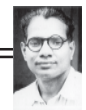

মানুষ নিজামশাহীর উচ্ছেদ চাইছিলেন। মানুষের এই আকাঙ্খা আমাদের দারুণভাবে সাহায্য করেছিলো এবং কংগ্রেস কর্মীরাও অনুভব করতো যে আমরাই একমাত্র এলক্ষ্য পূরণে জঙ্গী সংগ্রাম চালাচ্ছি। আমরা ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছিলাম এবং সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর সময়ও আমরা ভারত সরকারকে বলেছি তোমরা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজামশাহী উৎখাত করো। অত্যাচারী নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো এক কথা, কিন্তু নিজামশাহীর উৎখাতে ব্যাপক জনসমর্থন পুষ্ট হয়ে তাকে উৎখাত করতে সক্ষম হওয়া সেটা অন্য কথা।

এই অবস্থা সত্ত্বেও সশস্ত্র জনতা ছিল খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ। এভাবে আমরা সুপ্রশিক্ষিত ও লক্ষ্যে অবিচল একটি বাহিনী গড়ে তুললাম। কিনতু, শুধু জনসমর্থন ও কিছু সেকেলে হাতিয়ারের উপর নির্ভর করে এই সংগ্রাম কোন অবস্থাতেই নিজামশাহীর বিরুদ্ধে বাস্তবিক কোন লড়াই দেয়া বা ক্ষমতা দখল করার অবস্থায় ছিল না। এই দুর্বল সামরিক শক্তি নিয়ে জমিদারদের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করতে পেরে আমরা ছোট্ট সাফল্য অর্জন করলাম। শত্রুরা যেখানে ভারীমাত্রায় কেন্দ্রীভূত আমরা সেখানে আক্রমণে যেতে পারি না। কারণ, এ রকম বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর মত সামর্থ্য এবং তাদের মোকাবেলা করার মত যুতসই অস্ত্র সশস্ত্র কোনটাই আমাদের ছিল না। আমরা বড় ধরনের জন সমাবেশ করার জন্য তৈরি ছিলাম। কিন্তু তা করতে গিয়ে, উন্নত অস্ত্র ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকারী নিজাম সেনাবাহিনীর আক্রমণে আমাদের বহু কমরেডকে হারাতে হল। এর পেছনে অবশ্যই সামন্ত প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী কংগ্রেস দলের অন্তর্ঘাত ও একটি বড় কারণ ছিল।

ঘটনাক্রমের এই পর্যায়ে, নিজামকে ক্ষমতা ছাড়তে এবং রাজ্যটিকে ভারত ইউনিয়নের সাথে সংযুক্তির জন্য চাপ সৃষ্টি না করে, ভারত সরকার নিজামের সঙ্গে একটি "স্থিতাবস্থা"র চুক্তি স্বাক্ষর করল। প্রাক- স্বাধীনতা-পর্বে হায়দ্রাবাদে নিজামের সেনাবাহিনীর জন্য ব্রিটিশ সরকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করত। দেখা গেল, এই "স্থিতাবস্থা চুক্তি"তেও নিজামের

সেনাবাহিনীর জন্য ভারত সরকার কর্তৃক অস্ত্র সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার ধারা যুক্ত হল। তবে এটা ঠিক, কিছু অর্থ সাহায্য ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তৎকালীন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মুন্সীকে হায়দ্রাবাদে পাঠানো হল এজেন্ট- জেনারেল হিসাবে। যেহেতু তখনো হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশদের একজন রেসিডেন্ট কমিশনার ছিল, তাই মুন্সীও ভারত সরকারের পক্ষে সেখানে একজন কমিশনার নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ভাবুল, যে রাজ্যটি যুগের পর যুগ ভারত ভূখন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভারত সরকার সেখানে একজন হাই কমিশনার (রাষ্ট্রদূত) নিয়োগ করার ভাবনা চিন্তা করছিল। তবে ঐ সময় হায়দ্রাবাদে নিজামশাহী রাজন্য শাসনের অস্তিত্ব রক্ষার আশঙ্কায় ভীত, আতঙ্কিত থাকায় সেখানে ব্রিটিশ কমিশনারের ভূমিকা খুব একটা কার্যকর ছিল না। নিজামশাহীর সামনে তখন শুধু দুটো বিকল্পই খোলা ছিল। হয় গোয়া বা পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করা, নতুবা ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যদি নিজাম তার রাজ্যটিকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির পথে পা বাড়াত, তবে নিজামই হতেন ইতিপূর্বের অন্যান্য রাজন্য শাসকবর্গের মধ্যে বেশি ক্ষমতার অধিকারী। যদিও পরবর্তী সময়, সে সব ক্ষমতা সংকোচিত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিজাম সে পথে না গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এগোতে থাকলেন।

নিজামের এই মতলব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার " স্থিতাবস্থা চুক্তি" বহাল রেখেছে এবং এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে মুনাগালা ছিট মহলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আহত আমাদের কিছু কমরেডকে যখন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কুডাভা ক্রসিং-এ নিজামের পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমরা ভারত সরকারের কাছে জানতে চাই ছিট মহলগুলির মধ্যে অবাধ যাতায়াতে আমাদের মোটেই কোন অধিকার রয়েছে কিনা। আমরা কেন্দ্রের কাছে এই গ্রেপ্তারের ঘটনার বিশদ মানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ দাবি করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজামের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের এই দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। ভারত সরকার

তার নিজস্ব সেনাবাহিনী পাঠিয়ে আমাদের নিরাপত্তা দেবে বা তেলেঙ্গানার জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করবে— এই মোহ আমাদের কখনোই ছিল না। মুনাগালা বেস্ থেকে আহত যুদ্ধাদের অন্ধ্র সীমান্তে স্থানান্তরিত করার সব ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হয়েছে। অন্ধ্র সীমান্তে পৌঁছতে হলে আমাদের কুডাঙার মধ্য দিয়ে যেতে হত। তদুপরি, আমাদের পক্ষে প্রকাশ্যে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না। এই অঞ্চলটি অতিক্রম করতে আত্মগোপনে যাতায়াত করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। নিজামশাসিত এলাকা থেকে অন্ধ্র সীমান্তের সুরক্ষিত এলাকায় গোপনে আহতদের স্থানান্তরিত করার নানা কায়দা-কানুন সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হল। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের তদারককারীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করতে আমরা একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করি। কিভাবে এবং কোথা থেকে এসব অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল, এখানে তারই বশাদ বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু এসব অস্ত্রসমূহ আমাদের লড়াই করার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আমাদের এই নতুন শক্তি সঞ্চয়ে নিজাম সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমন কি নিজাম সরকার জানতেও পারেনি কত সংখ্যক আধুনিক অস্ত্র আমরা বহন করছিলাম। এরপর ১৯৪৮-র শেষদিকে শস্ত্র সংগ্রাম তীব্রতা লাভ করে।

ইতোমধ্যে এ খবর ব্যাপক অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দলের হাতে ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কংগ্রেস সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী কি করে তা নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে তুমুল মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যখন পাওয়াই গেল, তা যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন, তখন নতুন সরকার ও শাসকশ্রেণি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীইবা কি হবে, এসব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধে উঠে। পার্টি নেতৃত্বের অধিকাংশই ছিল বি টি রণদিভের লাইনের অনুসারী যাঁরা মনে করতেন, এই স্বাধীনতা মূলত ঝুটা স্বাধীনতা যা শুধু বৃহৎ বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ রক্ষা করবে। তিনি জনগণের হাতে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে সংগ্রাম তীব্রতর করার আহ্বান

জানালেন। এই সংগ্রামে তিনি আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করলেন কংগ্রেস সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদকে। নতুন সরকারকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের ঢাল হিসাবে আখ্যায়িত করলেন। বি টি রণদিভের এই যুক্তির ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে হলে সে সময়ের পার্টির প্রস্তাবসমূহ পড়ে নিতে হবে।

রণদিভের এই তত্ত্বকে অনুসরণ করে সংগ্রাম তীব্রতর করার কথা হল। ১৯৪৮ সালে যখন কোলকাতায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তখনও কাগজেপত্রে যোশীই ছিলেন পার্টি সম্পাদক। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে অন্ধ্রের বুদ্ধবার্মায় আমরা অন্ধ্র কমিটির তৃতীয় সম্মেলনে মিলিত হই। ১৯৪৭ এর শেষ দিকে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনে আমরা বি টি রণদিভের লাইন নিয়ে আলোচনা করি। আমরা তখন আইনি স্বীকৃত পার্টি। সেই সম্মেলনে আমি পি সি যোশীর অবস্থানকে কিছুটা সমর্থন জানাই। তবে, যেহেতু সম্মেলনের প্রায় সব কমরেডই জঙ্গী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন, তাই আমি যোশীর তত্ত্বের পুরোটাই হুবহু গ্রহণ করতে পারিনি। অন্যদিকে রণদিভের লাইনের পেছনেও নিজেকে সামিল করতে পারিনি। আমাদের সংগ্রামের অগ্রগতির স্বার্থেই পেটি বুর্জোয়াদের সমর্থন আমাদের প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, পার্টির প্রস্তাবিত লাইন কংগ্রেসে চূড়ান্ত ভাবেই বাতিল হল, পরিবর্তে একটি নতুন লাইন সামনে এল। রাজেশ্বর রাও, চন্দ্রম, ও এম বামবপুন্নাইয়া প্রমুখও রণদিভের ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তারা পেটি বুর্জোয়া ও ধনী কৃষককে আমাদের আন্দোলনের অংশীদার করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রশ্ন এটা নয় যে গোটা কংগ্রেস পার্টিটাই প্রগতিশীল কিনা। গান্ধীজি নিজে প্রগতিশীল কিন্তু তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাস করেন না। অপরদিকে বল্লভভাই প্যাটেল হলেন শোধনবাদী। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের মধ্যে একটি ছোট্ট প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সক্রিয় ছিল। আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বের গান্ধী-নেহরু প্রমুখকে প্রগতিশীল ও অন্যদের প্রতিক্রিয়াশীল - এভাবে ভাগ করতে পারি না। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে প্রগতিশীল- প্রতিক্রিয়াশীল চিহ্নিত করার কোন স্পষ্ট বিভেদ রেখা নেই। এই বিষয়টি নিয়ে পার্টি কংগ্রেসে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বস্তুত, যোশীর

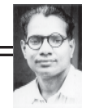

লাইনকে সমর্থন করে কংগ্রেসে আমি একটি দীর্ঘ নোট পেশ করি এবং তা প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হয়। ১৯৪৬ সালের পি সি যোশীর তত্ত্বের যুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য গৃহীত হয় এবং আলোচনান্তে তা বাতিল হয়ে যায়। ঐ সময় পার্টির অন্ধ্র ক মিটি মনে করে পেটি বুর্জোয়াদের থেকে আমাদের দূরে সরে থাকা ঠিক হবে না। এই প্রশ্নে অন্ধ্র নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ ছিল। কিছু গৃহীত পার্টি লাইনে পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে পূর্বেকার সমস্ত সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহের বিশাদ পূনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হল।

১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে কোলকাতায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু অন্ধ্র, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে পার্টি তখনো বেআইনি, তাই এই প্রদেশগুলির সব কমরেডই তখন আত্মগোপনে। যাই হউক, এই অবস্থায়ই আমরা পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত হই। পার্টির জাতীয় স্তরের এই কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক হল। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে রণকৌশলগত যে ভুল আমরা করে আসছিলাম তা আমি এখানে ব্যাখ্যা করতে চাই না। তবে ১৯৫১ সালের পরবর্তী কংগ্রেসে আমরা সেগুলি সংশোধন করতে পেরেছি। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে প্রমোদ দাশগুপ্তকে কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিট ব্যুরো কোথাও নেয়া হয়নি। কম: ইসমাইল ও কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়া হয়েছিল। ঐ সময় কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিট ব্যুরোর সদস্যদের তালিকা পেতে হলে পার্টির সম সাময়িক দলিলের আশ্রয় নিতে হবে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর প্রমোদ দাশগুপ্ত ব্যাঙ্গোক্তি করে আমার কাছে মন্তব্য করেন— যেহেতু তিনি শ্রমিক পরিবারের নন, তাই তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়া হয়নি,আর ইসমাইলকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়া হয়েছে, কারণ তিনি ছিলেন শ্রমিকশ্রেণির পরিবারের সদস্য। তিনি যুক্তি দেখান— তিনি নিজে ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছেন, কাজেই তিনি শ্রমিক হিসাবে গণ্য হতে পারতেন। যাই হউক, তাঁর পিতা একজন মধ্যবিত্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাঁর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় গুরুত্ব পায়নি। তিনি

তীব্র শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করেন ইসমাইলের সঙ্গে তুল্য মূল্য বিচারে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হলেন। উনার দাবির সপক্ষে তিনি আমাকে অনেক ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু আমার মনে হল,নেতৃত্বের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে উনার ধারনা খুবই অপরিণত। পার্টিতে এই রোগ এখনো বিদ্যমান। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির গঠনের প্রশ্নে কিছু পার্টি নেতৃত্বের মান অতিমানের বিষয় থাকা সত্ত্বেও, যা বড় ঘটনা তা হল কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পি সি যোশীর বাদ পড়া। বস্তুত যেহেতু বি টি আর চাইছিলেন যোশীকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সরিয়ে দিতে তাই তিনি হেরে গেলেন। আগেও যোশী কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন না। তাঁকে পরে কো-অট করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়া হয়। ঐ সময়ে চলতে থাকা তেলেঙ্গানা সংগ্রামকে বিবেচনায় রেখে মোহন কুমার মঙ্গলম পি সি যোশীর স্থলে রবি নারায়ণ রেড্ডির নাম প্রস্তাব করেন। পি রাজেশ্বর রাও, চন্দ্রম ও এম বাসবপুন্নাইয়াকে প্যানেলে রাখা হল কারণ তারা বি টি আর- এর লাইনকে সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন।

বি টি আর আমাকেও কেন্দ্রীয় কমিটি বা প্যানেলে রাখতে চাননি। তখন অন্ধ্রের তিন জন সদস্য আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়ার জন্য এই বলে জোরালোভাবে দাবি করতে থাকে যে আমি ইতোমধ্যেই আমার লাইন পরিবর্তন করে নিয়েছি এবং আমি আর যোশীর লাইনকে সমর্থন করি না। একই সঙ্গে তারা বি টি আর এর তত্ত্বের কিছু ত্রুটির দিক ও উল্লেখ করেন। বিশেষত ধনী জমিদার ও পেটি বুর্জোয়া প্রসঙ্গে। তারা আরো বলেন— এই ব্যর্থতার জন্য শুধু সুন্দরাইয়াকে দায়ি না করে সমগ্র পার্টিকে এর দায়ভার নিতে হবে। তারা যুক্তি সহকারে বলতে থাকেন — দক্ষিণ ভারতে পার্টি গড়ে তোলা, বিশেষত তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর আমি। কাজেই আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে কোন পদক্ষেপ সেখানকার পার্টি কর্মিদের মধ্যে ভুল বার্তা দেবে। এক্ষেত্রে নিচু স্তরের কর্মি সমথর্কদের মধ্যে নেতৃত্ব থেকে আমার বাদ পড়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তারা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন, নেতৃত্ব নির্বাচনের এটা কোন পদ্ধতি হতে পারে না।

বিটি রণদিভে এই কমরেডদের সাথে আর বিরোধ না বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাকে গ্রহণ করেন।

পার্টি নেতৃত্ব আমার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিল পি সি যোশীর ক্ষেত্রেও তাই করল। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কমিটির নামের তালিকা নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধিদের হাতে দেয়া হল। নির্বাচনের একটি নিয়ম হল, কোন প্রতিনিধি ইচ্ছে করলে প্রস্তাবিত তালিকার কোন একজনের বিকল্প নাম প্রস্তাব করে ভোট চাইতে পারেন। এরকম একটি ভোটে পি সি যোশীর স্থলে রবি নারায়ণ রেড্ডি নির্বাচিত হলেন। আমার স্পষ্টই মনে পড়ে, মোহন কুমার মঙ্গলম পি সি যোশীর স্থলে রবি নারায়ণ রেড্ডির নাম প্রস্তাব করেন। আমরা অবশ্যই যোশীর পক্ষে ভোট দিই। কিন্তু তৎকালীন তেলেঙ্গানা সংগ্রামের তাৎপর্য রবি নারায়ণ রেড্ডি জিতিয়ে দেয়। রবি নারায়ণ রেড্ডি পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি আগেও দীর্ঘদিন ছিলেন। তেলেঙ্গানা সংগ্রাম পরিচালনায় গোপন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সরিয়ে দিতে হয়। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে যোশীর পরিবর্তে রবি নারায়ণ রেড্ডিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত করার পেছনে যে গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার বিন্দু বিসর্গও আমি জানতাম না। পার্টি নেতৃত্ব, বিশেষ করে এম বাসব পুন্নাইয়া, কুম্ভম পতি (জেষ্ঠ্য) কে বুঝানোর চেষ্টা হয়েছিল এই বলে যে, যেহেতু রবিনারায়ণ রেড্ডি আধুনিক স্তরে নেতা নন, এবং সাংগঠনিক বিষয়েও তেমন দক্ষ নন, তাই তাঁকে যাতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচনের জন্য তুলে ধরা না হয়। হয়তো এই দিকটি তারাও ভেবে থাকতে পারেন,তবে, সত্যিই ভেবেছিলেন কিনা আমি নিশ্চিত নই। তেলেঙ্গানার শক্তিশালী সংগ্রামের বিবেচনা করে তারাও রবি নারায়ণ রেড্ডির বিরুদ্ধে পার্টি নেতৃত্বকে বুঝাতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

কুম্ভপতি সত্য নারায়ণ এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন কিনা এ ব্যাপারে আমি অবহিত নই। কেন্দ্রীয় কমিটিতে রবি নারায়ণ রেড্ডির অবস্থানকাল সম্পর্কে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে আবারও উল্লেখ করতে চাই, মথুরায় অনুষ্ঠিত পার্টি তৃতীয় কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে

তাঁকে পুনরায় সরিয়ে দেয়া হয়। কাজেই এটা ঘটনা যে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নেতৃত্বের একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক ত্রুটি ছিল। দুর্ভাগ্য- বশত: কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেয়ার পরিবর্তে পি সি যোশী পার্টির বিরুদ্ধে মনগড়া ক্ষোভ জানাতে শুরু করলেন। আমরা অবশ্য জানতাম, বি টি রণদিভে যোশীকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে অনড় ছিলেন। বি টি আর অনেক কথা প্রসঙ্গে আমাকে এ ইংগিত দেন। তিনি বলতেন— পি সি যোশীর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার শরিক তিনি হতে পারেন না। স্বভাবতই, আমার মনে হল, তিনি পার্টিতে একটি নতুন মতধারা নিয়ে এগোতে চাইছেন। তাঁর ঘোষণায় এটা আরো স্পষ্ট হল যে তাঁর মত ধারার পেছনে সংখ্যা গরিষ্ঠতার সমর্থন রয়েছে এবং এর বিপরীতে দাঁড়ানো যেকোন প্যানেল পরাজিত হবে। এবং এরই ফলশ্রুতি হল রবি নারায়ণ রেড্ডির কাছে পি সি যোশীর পরাজয়। একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বি টি রণদিভে হয়তো এ ধরনের ভুল করে বসতেন না। কিন্তু শক্তিশালী তেলেঙ্গানা আন্দোলন এবং সেই আন্দোলন থেকে কমরেড রবি নারায়ণ রেড্ডির একজন কঠিন ব্যক্তিত্ব হিসাবে উঠে আসা এই ভ্রান্তি ঘটার পেছনে কাজ করেছে। তেলেঙ্গানা আন্দোলন সারা দেশকে পথ দেখাবে— এই ছিল তৎকালীন সময়ের অবাধ স্লোগান। যদিও পার্টি কংগ্রেসে এভাবে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ব্যাখ্যা হয়নি। এরকম একটি পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রতিনিধি রবি নারায়ণ রেড্ডির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ভোট দিতেন না।

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর আবেগপ্রবণ হয়ে সমস্ত ভুলের দায় নিজের কাঁধে নিলেন। তবে তাঁর জবাবী ব্যাখ্যার বড় অংশ জুড়ে এই ধারণাই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল যে, তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাকেই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম — আপনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকুন বা না থাকুন তাতে কিছুই যায় আসে না। আপনি কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসারে কাজ করতে থাকুন। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে নব নির্বাচিত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন।

কোলকাতা পার্টি কংগ্রেসের পর নতুন পলিটব্যুরো গঠিত হল। তেলেঙ্গানার শক্তিশালী আন্দোলনকে বিবেচনার রেখে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে তিন জনকে, কমরেড এম বাসবপুন্নাইয়া, সি রাজেশ্বর রাও ও এম চন্দ্রমকে পলিটব্যুরোতে অন্তর্ভুক্ত করে অন্ধ্র কমিটিকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হল। এভাবেই পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ধারায় অতি দ্রুত একটি পরিবর্তন ঘটানো হল। এই পরিবর্তনকে আমাদের অনুধাবন করতে হলে তেলেঙ্গানা সশস্ত্র সংগ্রাম ও তৎপরবর্তী ঘটনা শ্রমের আলোকে। পার্টি কংগ্রেস থেকে আমাদের ফিরে আসার পর আন্দোলন আরো তীব্র হল। ১৯৪৬ এর গোড়া থেকেই শুধু অন্ধ্র কমিটির সম্পাদকের দায় দায়িত্ব পালন করাই নয়, সশস্ত্র গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজটিও আমাকে দেখতে হত। এ কারণে, সশস্ত্র সংগ্রামের দায়িত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এর যোগসূত্র রক্ষা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করার জন্য আমি পার্টিকে বললাম। আমার প্রস্তাব নিয়ে অন্ধ্র কমিটিতে চুলচেরা আলোচনার পর তাতে সম্মতি পাওয়া গেল। আসলে পার্টির বেআইনি অবস্থায় আমি অন্য শাখায় কাজ করতে পারতাম। কিন্তু সারা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে তখন তেলেঙ্গানা সংগ্রামের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এজন্য, পার্টির একটি আলাদা পরিচালন কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। এ ধরনের একটি কেন্দ্র আমরা গড়ে তুললাম যেখান থেকে অন্ধ্র কমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সমস্ত ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। পার্টিতে আমার অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে, পার্টিতে আমিই ছিলাম একমাত্র সদস্য যে ১৯৩৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত (১৯৮৫) এক নাগারে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিল। অবশ্যই বি টি রণদিভে, পি সি যোশী ও এস ভি ঘাটে প্রমুখরা আমার আগে থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৩ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসে কমরেড-ই এম এস নাম্বুদরিপাদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসেন। প্রথম থেকে অন্য কারা কারা কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোতে ছিলেন তা জানতে পার্টির দলিল দেখতে হবে।

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম : অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের শুরু থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সালের পুরো সময় , অনেক ঘটনাই ঘটেছিল যেগুলি একটার সাথে অন্যটা সম্পর্কযুক্ত এবং যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত শিক্ষা নিতে পারি। আন্দোলন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, মানুষ যখন স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে যায় এমন অমল অনেক পরিবর্তন ঘটে যা সাধারণত: আমরা ভাবি সম্ভব নয়। উপযুক্ত সময়ে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সেই সময়ের পশ্চাদ্‌পটে ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং নিজামের প্রতি ঘৃণা, শুধুমাত্র বড় বড় জন জমায়েতের মধ্যেই সীমাবদ্‌দ ছিল না। বিষয়গত অবস্থা কৃষকদের ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষেই ছিল— যা আমি আগেই বর্ণনা করেছি। এই অবস্থায় আমাদের প্রাথমিক কাজ ছিল আরো বেশি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ যোগাড় করা। প্রায়োগিকভাবে বলা যায় আমাদের অবস্থান ছিল দক্ষিণ প্রান্তে, গ্রামীণ জনগণ এবং কৃষকদের মধ্যে যে উজ্জীবিত বৈপ্লবিক উৎসাহ উদ্দীপনা, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে রয়েছে, তা থেকে অনেক দূরে। বাস্তবেও অস্ত্র আইন আমাদের প্রতিবন্ধক ছিল এবং এই আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল, অস্ত্র চালনার তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা ছিল না। সামরিক ছাউনী ও অস্ত্রের ডিপোগুলিও সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও দক্ষিণে ছিল না। কাজেই অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ যোগাড় করা খুবই কঠিন ছিল। এই সময়ে আমরা আমাদের সীমিত যোগাযোগের উপর ভিত্তি করেই অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম। এমন কি অন্ধ্র অঞ্চল, বন্দর এবং খনি অঞ্চল থেকেও অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম।

ফার্মের শ্রমিকরা যারা জমিদার ও ধনীদের বাড়িতে কাজ করতো, বিশেষ করে নালগোন্ডা এবং ওয়ারঙ্গণ এলাকায়, তারাও তাদের মালিকরা

কোথায় শট্‌গান কিংবা রিভলভার রাখতো তা জানতো। কাজেই তারাও অস্ত্র চুরি করতো এবং মাঝে মাঝে জমিদারদের মারধর করে অস্ত্র ছিনিয়ে আমাদের কাছে দিয়ে দিতো। আমরাও গান পাউডার তৈরি করতাম এবং নারকেলের মালায় সেগুলিকে ঠেসে পিতল মুড়ে দেশি বোমা হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমাদের কাছে এই বোমাগুলিকে আরও বেশি শক্তিশালী করার মতো ছিদ্র করার যন্ত্রপাতি কিংবা ফিউজ ছিলনা। পরবর্তী সময়ে এগুলিকে আরও উন্নত করা হয়। এমন কি গ্রামীণ কর্মকারদের সাহায্য নিয়ে আমরা অস্ত্র নির্মাণ কারখানাও গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। এদের সমর্থন আমাদের নিতে হয়েছিল। সাধারণ মানের স্থানীয় বন্দুকের নলও এসব কারখানায় তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এধরনে অনেক ইউনিট ছিল। তবুও অস্ত্রের পরিমাণ কম এবং খুবই সেকেলেছিল। প্রত্যন্ত গ্রাম এবং বনাঞ্চলে যুদ্ধরতদের কাছে যুদ্ধের উপকরণ পৌঁছে দেবার কাজটাও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

যুদ্ধরত ইউনিটগুলির মধ্যে সমন্বয় রাখা এবং যোগাযোগ করা ও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু তখন আগে থেকে সবকিছু ঠিকমতো ব্যবস্থা না করে সামনে এগিয়ে যাওয়া হতো না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় কৃষ্ণা জেলাতে আমাদের লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলি কাজে এসেছিল। এই জায়গাগুলি শুধুমাত্র আমাদের মিটিং করার কাজেই লাগতো না, গেরিলা যোদ্ধাদের পেছনে সরে এসে অবস্থান করার কাজেও লাগতো। এই ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার পেছনে সমস্ত পার্টিই যুক্ত ছিল।

সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালীন সমগ্র সময়ে আমার নিজস্ব দেহরক্ষী এবং সংবাদবাহক ছিল। রিলে ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা সংবাদ আদান প্রদান করতাম। সাধারণত: আমার মতো নেতৃস্থানীয় কমরেডরা রাত্রিবেলা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করতাম। জায়গা যতদূরেই হোক না কেন, আমরা কোন যানবাহন ব্যবহার করতাম না, এমনকি সাধারণ বাসগাড়িও না। যোদ্ধাদের কছে যুদ্ধের উপকরণ পৌঁছে দেবার জন্য আমরা জনগণকে যুক্ত করতাম না। যারা বাসে করে যাতায়াত করতো, তাদেরও

এসব সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেবার কথা বলতাম না। কারণ, তাহলে পুলিশ এদের গার্ড করতো, জিজ্ঞাসাবাদ করতো এবং পরিণতিতে সশস্ত্র যোদ্ধাদের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কাজেই আমরা সমস্ত ধরনের যানবাহন এড়িয়ে চলতাম। যুদ্ধের উপকরণগুলি সাধারণত সাইকেলে অথবা পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয়া হতো। কমরেডদের জন্য এগুলিই ছিল মেনে চলার মতো কিছু সাধারণ নিয়ম।

গোপনে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের সন্ধানে যত্রতত্র অনুসন্ধান চলছিল। সরকার জানতো যে, অস্ত্রের যোগান প্রধানত কৃষ্ণা জেলা থেকেই আসছিল সেজন্য আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হতো। সীমান্ত তালুকগুলিকে ছিল সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধানের কাজ। তারা আরও অনুমান করেছিল যে, গুড়িভাড়া, বিজয়ওয়ারা এবং গন্নাভরম ইত্যাদি জায়গাতে আমাদের আত্মগোপনের স্থান আছে, তাই এসব অঞ্চলেও তারা নজর রাখতো। অবস্থা এমন ছিল যে, একদিন অথবা দুইদিনের মধ্যে আমাদের শিবিরগুলিকে সরিয়ে নিতে হতো। শিবিরগুলিতে কিছু হচ্ছে একথা যাতে আমাদের প্রতিবেশিরাও জানতে বা বুঝতে না পারে সেজন্য আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হতো। তবে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, আমাদের উপর মানুষের সন্দেহ জাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কারণ গ্রামে প্রথম নজরেই একজন আগুন্তুককে গ্রামের মানুষ চিনতে পারে। এমন অনেকগুলি গ্রামের মানুষই জানতো যে তাদের গ্রামে অপরিচিত লোক আছে, কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা তারা বিন্দুমাত্র অনুমান করতে পারতো না। এমন কি কংগ্রেস শাসকদের নামিয়ে আনা দমনপীড়নের ভয়াবহ দিনগুলিতেও গ্রামের সাধারণ মানুষ কর্তৃপক্ষের কাছে অথবা পুলিশের কাছে তাদের গ্রামে অপরিচিত লোকের অবস্থানের কথা প্রকাশ করেনি। বরং আমরা যাতে সরে যেতে পারি সেজন্য পুলিশের চলাচলের কথা আমাদের আশ্রয়দাতার কাছে বলে যেতো। তবে আমরা সব সময়ই জায়গা পরিবর্তন করতাম।

সেই সময় বাসিরেড্ডি রামা রাও এর ভাই, তার নামটা মনে করতে

পারছি না। আমার সংবাদবাহক ছিল। সে সুশিক্ষিত এবং পার্টির তালুক কমিটির একজন সদস্য ছিল। সরবরাহকৃত সামগ্রীর বোঝা নিয়ে সে আমার সাথে থাকতো। সাথে সাথে, আমার নিয়মিত সংবাদবাহক হিসাবে থাকতো কাত্রছাড়া চিনা ভঙ্কএয়াড (ভেঙ্কট্রে যুড়ু) সে ১৯৪৯ সালের কোন এক সময়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। গন্নাভরমের কাছাকাছি কোন গ্রামে তার বাড়ি ছিল। এছাড়া ছিল সবরগুডেম গ্রামের রঙ্গা রাও নামে একজন। কয়েক মাস বাদে সে মারা যায়। এরা সবাই আমার পাশে পাশে থাকতো এবং আমার সংবাদবাহক হিসাবে কাজ করতো। এসব কমরেডরা প্রচন্ড পরিশ্রম করতো। আমার বইপত্র, ওষুধের বাক্স এবং যোগাযোগ করার অন্যান্য জিনিষপত্র থাকতো। সাধারণভাবে আমি আমার কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র নিজেই বহন করতাম। একটা ওয়াটার প্রুফ ক্যানভাস ব্যাগে এই সব জিনিষ ভরা থাকতো।এই ১০-১৫ কিলো ভারী ব্যাগ আমি কাউকে বহন করতে দিতাম না। এমনিতে আমরা রাত্রিবেলা মাঠের উপর দিয়ে যাতায়াত করতাম। একদিন, শুধুমাত্র পোশাক পরিবর্তন করার সময় একজন একটু ব্যাগটা বহন করেছিল। পরবর্তী সময়ে সে মন্তব্য করেছিল যে, এই ব্যাগটা বহন করা একটা বাছুর বহন করার মতোই। আমাদের মধ্যে এধরনের সৌভ্রাতৃত্ব ছিল।

মাঠের উপর দিয়ে চলার সময় আমরা মাঝে মাঝে দূর গ্রামের কৃষি শ্রমিকদের থাকার জন্য তৈরি করা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘরে বিশ্রাম নিতাম। গন্নাভরমের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় কয়েকদিনের জন্য আমার হেড কোয়ার্টার ছিল। নিজাম রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাসকরা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমরেডের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাকে এই বিশাল দূরত্ব হেঁটে যেতে হতো। কৌশলগতভাবে আমাদের আসার খবর প্রকাশিত কিংবা এনিয়ে গালগপ্পো তৈরি হবার আশঙ্কায় তা আগাম জানানো হতো না। যদি এনিয়ে কোন অতিরিক্ত সতর্কতা নিতো, তা ও ছিল অস্বাভাবিক বলে। এসব এড়ানোর জন্য সংবাদবাহক আগাম এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিতো। আমি একটু দূরে অবস্থান করে যখন সব কিছু স্বাভাবিক বলে সংকেত দেয়া

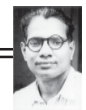

হতো, তখনই বাড়িতে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ কমরেডদের সাথে দেখা করতাম। যাহোক, এই সবটা দূরত্বই আমাকে হেঁটে কিংবা কখনো কখনো সাইকেলে অতিক্রম করতে হতো। সাধারণত: কৃষকদের মতো দেখাতে আমার পরনে থাকতো ধুতি ও কোর্তা। স্বাভাবিকভাবে আমি যে পোশাক পরি তা পরার কোন প্রশ্নই নেই। কারণ আত্মগোপনে থাকার সময়ে এমন পোশাকই পরতে হবে, যাতে তোমাকে একজন স্থানীয় মানুষ বলেই মনে হয়। তুমি এমন কোন আচার আচরণ করবে না, যা স্থানীয় মানুষের সাথে মিলে না।

একবার আমি গন্নাভরম থেকে সাইকেলে ভিরালাপদু গেলাম। কাঞ্চি কাচেরলা থেকে ভিরুলাপদু যাওয়ার জন্য আমাদের একটা নতুন রাস্তা বেছে নিতে হলো। একজন স্থানীয় মানুষকে আমাদের সাথে নিতে চাইলাম। সে সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগলো। এতে বাড়িতে ভেতরে থাকা মহিলারা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলো। কারণ পুলিশের চর বাড়িতে ঢুকতে পারে সেই আশঙ্কায় রাত্রিবেলা ঘরের দরজা না খোলার জন্য সাবধান করা হয়েছিল। গেরিলাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলে এমনিতেই বাড়ির লোকেরা পুলিশের সন্দেহের তালিকায়। কাজেই সেই মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি করাতে সংবাদবাহক ফিরে এলো। সে আমাকে বললো, বাড়ির ভেতরে থাকা মহিলা প্রচন্ড হৈ চৈ করছে। আমি এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বললাম, " আমি সুন্দরাইয়া এসেছি।" যাহোক সেই মহিলা তখনও বিড় ভিড় করছিলো। কারণ আগাম খবর দেয়া ছাড়া সুন্দরাইয়া কোন বাড়িতে যায় না বলে সে জানতো। তাই এই অবস্থায় সে কি করে দরজা খুলবে? সে ভেবেছিল আমি মিথ্যে কথা বলছি এবং একজন পুলিশের চর। যদিও সেই সংবাদবাহক এই গ্রামেরই ছিল, কিন্তু মহিলাটি তাকে চিনতে পারছিল না। আমি তাকে বললাম, আমাকে চিনতে না পারলে এ কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু তাকে চিৎকার করতে এবং প্রতিবেশিদের সামনে কোন নাটকীয় দৃশ্য তৈরি করতে নিষেধ করলাম। সেই মুহূর্তেই আমরা সে জায়গা ছেড়ে নিজস্ব পরিচিত গ্রামের বাইরের পথে চলতে লাগলাম। সেটা ছিল একটা ভয়াবহ বিপজ্জনক পরিস্থিতি। যদি প্রতিবেশিরা বেরিয়ে আসতো

তবে ঝামেলায় পড়ে যেতাম। সমস্ত রকমের পরিচিতি দেয়া সত্ত্বেও মহিলা যখন আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকাতে অস্বীকার করলেন, তখন আমরা তার কোন ঝুঁকি নিলাম না। আত্মগোপনে থাকার সময়ে জীবনে এধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। ক্লান্ত থাকায় আমরা এনিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। মাঠের ভতর দিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আমাদের খুব অসুবিধা হতো, তবে সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে সাইকেল ছিল। আমি শুধু ভিন্ন পথে গ্রামের বাইরে দিয়ে যাবার জন্য একজন স্থানীয় গাইড চেয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে ঐ মহিলা সমস্ত ঘটনা আমাদের সংযোগ রক্ষাকারীর কাছে বলেছিল। যদিও গ্রেপ্তার হবার ভয়ে সে রাত্রে সেই ব্যক্তি ঐ বাড়িতে ছিল না। মহিলা যাতে সে রাতের ঘটনার কথা কারো কাছে না বলে, সেই কথা আমি সংযোগ রক্ষাকারীকে বলে দিলাম, কারণ ঐ অঞ্চলের পুরোটাই আমাদের আন্দোলনের বিরোধী ছিল। আসল ঘটনা শুনে পরিবারের লোকেরা খুব দুঃখিত হলো এবং আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে চাইল। আমি তাদের বললাম এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আগাম খবর না পাঠিয়ে আমরাও ভুল করেছি। পরিবারের সদস্যরা বললো যদি তাদের কাছে আমাদের আসার আগাম খবর থাকতো তবে চিৎকার করার বদলে তারা তাদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল।

একবার ঐ গ্রামে আমি গিয়েছিলাম। তখন প্রায় ভোর ৪ টা বাজে। সেই গ্রামে আশ্রয় ও আত্মরক্ষার জন্য আরো একটা বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির মালিক ছিল একজন সাধারণ কৃষক, নাম মাল্লী রেড্ডি। এছাড়া জানকী রামাইয়া নামে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমাদের পার্টির একজন সদস্য ছিল। সীমান্ত এলাকায় যাতায়াতের সময় ঐ গ্রামে আমার স্বল্পকালীন অবস্থানে তারা সবধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতো। এরকম ভিরুলাপদু আমাদের পার্টির একটি শক্তিশালী গ্রাম ছিল। কৃষক ঘরের মহিলারাও খুব সাহায্য সহায়তা করতো। যখন চূড়ান্ত দমনপীড়ন শুরু হলো, তখন আমরা গ্রামের বাইরের অংশে থাকা হরিজনদের বাড়িতেও থেকেছি। সমস্ত হরিজনওয়াদা গ্রাম জানতো যে আত্মগোপনকারী কমরেডরা সেখানে আসে ও থাকে। কিন্তু

অন্যের কাছে এ সম্পর্কে তারা বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করতো না। যাহোক, এত ছোট ঘরে বসা এবং আলোচনা করা আমাদের পক্ষে খুব অস্বাচ্ছন্দ্যকর ছিল। একমাত্র সেই কারণেই আমরা ছোট কিংবা মাঝারি কৃষকদের বাড়িতে থাকতাম। সেই সময় ধনী কৃষকরা আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকায় তাদের বাড়িতেও আশ্রয় নিতাম। ধনী কৃষক এবং জমিদারদের মধ্যে আমাদের বেশ বড় একটা সমর্থক অংশ ছিল। তারা সেই ১৯৪৭সাল থেকে অর্থাৎ যখন আমরা অভ্যুত্থান শুরু করলাম, আমাদের আশ্রয় দিতো। কিন্তু তবুও প্রধানত আমরা মাঝারি ও ধনী কৃষকদের বাড়িতেই থাকতাম।

একদিন আমাকে দুগ্গিরালাপদু থেকে ভিরুলাপদু যেতে হয়েছিল। আমি ভিরুলাপদু সকাল ৩ টা অথবা ৪টায় পৌঁছলাম। সেখানে থাকা সুবিধাজনক না হওয়ায় আমি অন্য একটা গ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম। সেদিন সেই গ্রামে একটা পুলিশ দল ছিল। কাজেই ভিরুলাপদুতে সারাদিন থাকা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সেজন্যই আমাকে সে জায়গা এড়িয়ে কাছাকাছি অন্য একটা আশ্রয়ের সন্ধান করতে হয়েছিল। জানকী রামাইয়ার বাড়ির ছিল সেই গ্রামের বাইরের প্রান্তে। আমি আমার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে তার বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সেদিন সে বাড়ি ছিল না। এমন কি আমাকে আরো এগিয়ে যেতে হলে সংবাদবাহকের প্রয়োজন কিন্তু আমার সাথে কোন সংবাদবাহকও ছিল না। তাই আমি একা একাই হাঁটতে লাগলাম এবং যে সময় জানকী রামাইয়ার বাড়িতে পৌঁছলাম তখন আমি খুবই ক্লান্ত। তার স্ত্রী জাগা ছিল। তাকে বললাম এক দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে আমি ভোর বেলা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো। তাকে আরো বললাম, যদি আমি নিজে উঠতে না পারি তবে সে যেন আমাকে ভোর ৫টায় জাগিয়ে দেয়। যা হোক, আমার প্রাত্যহিক অভ্যাসবশত: আমি নিজেই ঘুম থেকে উঠলাম। আমি গভীর ঘুমে থাকলেও আমার মনের ঘড়ি টিকটিক করে চলে। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি জানকী রামাইয়ার স্ত্রী তখনও জেগে রয়েছে। সে তখন নয় মাসের গর্ভবতী ছিল। যতক্ষণ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম সেই সময়টায় সে অনবরত বাড়ির চারপাশে এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় নজর রাখছিল। তার এই অতি

সতর্ক প্রহরার জন্য আমি বিস্মিত। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে না নজরদারি করে চলেছিল। সে হেসে চুপচাপ রইলো। আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। আমি জানি যতক্ষণ আমি ঘুমিয়েছি সেই সারাটা সময় নজরদারি করেছে। যদিও এজায়গাটা কোন বনাঞ্চল নয়। তবুও কমরেডদের আত্মগোপনে থাকার পক্ষে খুবই সুরক্ষিত। গ্রামের মহিলারা আমার অবস্থানকালীন সময়ে সতর্কতামূলক কাজ করেছে। এমন অনেক ঘটনাই আছে।

তারপর মাঠ পেরিয়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলাম। নিজাম রাজ্যের এই অঞ্চলে যেদিক দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করলাম সেই এলাকায়, বানাপুরম, মক্তাপুরম, বোড়ালাবান্দা, গোকিনেপল্লী এবং নেলাকান্ডাপল্লী ইত্যাদি নামে অনেকগুলি গ্রাম ছিল। কিছু কিছু হেডকোয়ার্টার্স থাকা সত্ত্বেও সাধারণত আমরা এসব গ্রামে থাকতাম না। মাচ্চা বীরাইয়ার নেতৃত্বে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্কোয়াড ছিল। যখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছলো, সেই স্কোয়াডকে বনাঞ্চলে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। এই সশস্ত্র স্কোয়াডগুলি এসব গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে আমাকে পাহারা দিতো, কারণ কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং সংগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় তারা কি সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পরতো। সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা গ্রামে থাকা কম্যুনিস্টদের উপর বর্বর অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। বীরাইয়া স্কোয়াডে কম পক্ষে দশ জন সদস্য ছিল। এদের মধ্যে দুই বা তিনজন ছিল কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলার, বাকি সবাই ছিল আশপাশের গ্রামের চাষী এবং কৃষি শ্রমিক। আমরা সংগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেই স্কোয়াডের একটা সভা ডাকলাম। এই সমস্ত সভাতে সাধারণত সশস্ত্র সংগ্রামের সমস্ত গতিপ্রকৃতি অর্থাৎ জনগণের সমর্থন, শত্রুর কৌশল এবং স্কোয়াডগুলির মধ্যে আন্ত: শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। শিক্ষিত এমন কি সাধারণ কর্মীরা ও তৎক্ষণাৎ সংগ্রামের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ ছিল।

স্কোয়াড সদস্যদের সমালোচনার জন্য বিরক্ত হবার মতো মানুষ

কমরেড বীরাইয়া ছিল না। সে তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো এবং যথাযথ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতো। সে কোন কোন স্কোয়াড সদস্যের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি বাতিল করে দিতো না, বরং তার চলার পথে এই বিষয়গুলির প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতো। এই কারণেই সে তার স্কোয়াড সদস্যদের কাছে এত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিল। যদিও সে নিয়ে সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও স্কোয়াডের দুর্বল ও দরিদ্র পরিবার থেকে আসা স্কোয়াড সদস্যদের সাথে মেলামেশা করতে অভ্যস্ত ছিল। তাছাড়া প্রচন্ড বর্বর অত্যাচারের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার মতো নেতৃত্বদারিকারী কমরেডও ছিল না। সে সমস্ত ঝুঁকির মুখোমুখী হতো এবং কর্মী ও জনগণকে প্রেরণা দেবার জন্য সমস্ত এলাকায় ঘুরে বেড়াতো। জানকী রামাইয়া মাল্কাপুরমের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করে। যে তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সে গ্রামেই থাকতো এবং তেলেঙ্গানা এলাকায় যেতো না। বাস্তবে সে সংঘর্ষপূর্ণ অঞ্চলকে এড়িয়ে চলতো। সে জন্য আমি তাকে একবার সাবধানও করেছিলাম। তাকে সতর্ক করে বলেছিলাম, যদি সে লড়াই চলা এলাকায় গিয়ে কর্মীদের নেতৃত্ব না দেয় তবে তাকে সমস্ত সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। ইতোমধ্যে অনেক ঘটনাই প্রকাশ্যে এলো এবং জানকী রামাইয়া ১৯৫২ সালে আইন কমিটিতে যোগ দিল। যাহোক, মাচ্চা বীরাইয়া পরবর্তী সময়ে সেই অঞ্চলে অনুসন্ধানের সময় সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যায়। তাই বীরাইয়ার স্কোয়াড সদস্যদের আলোচনা শেষ হবার এক দুইজন সশস্ত্র কর্মী আমাকে গ্রামের ভেতর দিয়ে পিন্ডিপ্রুলুতে পৌঁছাবার সময় পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলো।

আমি পিণ্ডিপ্রলুতে গিয়ে সি. লক্ষ্মী নরমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। ভয়ানক অত্যাচারের কারণে সূর্যপেটার কিছু কিছু স্কোয়াডের সদস্যরাও সেখানে ছিল। স্কোয়াড সদস্যদের জন্য পিণ্ডি প্রলু একটি সুরক্ষিত জায়গা। দেবুলাপল্লী ভেঙ্কটশ্বর রাও, বি. নরসীমা রেড্ডি, স্বরাজ্যম এবং থিরুমল রাও প্রভৃতি কমরেডরা এসব স্কোয়াড এর সাথে ছিল। আমরা সংগ্রামের বিভিন্ন বিষয় এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তারা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন

হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করলাম। পিণ্ডিপ্রলু প্রধান হেডকোয়ার্টার্স হিসাবে কাজ করতো। এখন থেকেই তেলেঙ্গানার বিভিন্ন সংঘর্ষ এলাকার স্কোয়াড সদস্যদের পাঠানো হতো। এখানে আমাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ মজুত থাকতো। স্কোয়াড সদস্যরা এখানে আসতো, বিশ্রাম নিতো এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে চলে যেতো। গ্রাম থেকে এক বা দুই মাইল দূরে একটা নদী ছিল। পাবর্ত্য এলাকায় কিংবা কোন নদীর ধার থেকে চলার সময় আমরা একই রুটিন ধরে চলতাম। বিভিন্ন জায়গায় থেমে থেমে, খাবার তৈরি করা, যাওয়া তারপর আবার চলা। গ্রামবাসীরা কারো কাছে আমাদের কথা প্রকাশ করতো না। পুলিশ জানতো যে অনেক বিপ্লবী এই বনাঞ্চলকে তাদের বিশ্রাম নেবার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু তারা কিভাবে এর মোকাবিলা করবে তার পদ্ধতি জানা ছিল না কিংবা আমাদের আক্রমণ করার মতো সাহসও তাদের ছিল না। আধুনিক সৈন্য বাহিনী যদি সেখানে যেতো, তবে ঘটনা অন্যরকম হতো।

সেই সময়ে পিন্ডিপ্রলু থাকার সময়ের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। একদিন দুইজন অপরিচিত লোক আমাদের সুরক্ষা এলাকায় ঢুকে পড়লো। তারা সশস্ত্র স্কোয়াডে যোগ দিতে চায়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যে এখানে আছি তা তারা কিভাবে জানে এবং তাদের পুলিশের চর বলে সন্দেহ করলাম। যা হোক, তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের কথা বললো এবং অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের স্কোয়াডে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সাধারণত এমন অনেক গরিব মানুষ ছিল যারা সমস্ত আর্থ-সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের স্কোয়াডে যোগ দিতে চাইতো। তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শুধু লড়াই করা। সময় সময় এরা আমাদের স্থানীয় স্কোয়াডগুলির কাছে আসতো। কিন্তু যদি তারা হেড কোয়ার্টাসের পথের সন্ধান পেয়ে যায়। তবে তা হবে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। সর্বজনগ্রাহ্য একটা সন্দেহ ছিল যে, এসমস্ত অপরিচিত মানুষ পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য আসে এবং স্কোয়াডে যোগ দেয়। তাই এই দুইজনকে তাদের

 পি এস জন্মশতবর্ষ সিরিজ (৩)/

অতীত সম্বন্ধে জানার জন্য অসম্ভব জেরা করলাম। যদিও আমাদের দৃঢ় সন্দেহ ছিল যে এরা পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হবে। এরকম ভাবলেও তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলাম না। তাই আমরা এঁদের আমাদের এলাকার বাইরে অন্য একটা জায়গায় নিয়ে এলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম এদের দুজনকে স্কোয়াডের সাথে যুক্ত করা হবে না। তবে পুলিশের চর কিনা এ সংক্রান্ত বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ পাবার আগে এদের কোন ক্ষতিও করা হবে না। যদি তক্ষণই ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এ অঞ্চলে আমাদের বিরাট সংখ্যক উপস্থিতির কথা এদের মাধ্যমে গল্পের আকরে বাইরে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। বাস্তবে আমরা অন্য একটা সুরক্ষিত এলাকার সন্ধানে ছিলাম, তাই ধীরে ধীরে নূতন জায়গায় এখানকার সব কিছু সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই অন্তবর্তী সময়ে আমরা তাদের চলা ফেরার দিকে নজর রাখা এবং এরা যাতে অন্য কোথাও যেতে না পারে সেজন্য তাদের স্কোয়াডের সাথে নিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা ছিল হেডকোয়ার্টাসে থাকার সময়ে একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

একই সাথে স্কোয়াডের সদস্য অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ থাকা সত্ত্বেও স্কোয়াড নিয়ে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছিল। আমার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যারও সমাধান করার প্রয়োজন ছিল। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়— বালাপালা গ্রামের শেষা রেড্ডি এবং তার স্ত্রীর কথা। মহিলাটি পরে তার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে ওয়ারাঙ্গলের মোহন রাওকে বিয়ে করে। স্বামীর সাথে অন্য মহলির সম্পর্ক আছে এই সন্দেহেই এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঝগড়া হতো। আমি তাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করতাম এবং এ ধরনের জটিল সময়ে এই রকম বিপজ্জনক কাজ না করার জন্য সর্তক করে দিলাম। যখন সে কথা শুনলো না, তখন তাদের পক্ষে প্রতিকারের একমাত্র পথই হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা এবং আলাদা আলাদা বাস কার কথা বললাম। যদি ও আমরা এদের দুজনের সমস্যা মিটিয়ে নেবার কথাই বলতাম। বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কোন শাস্তি দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একইভাবে মাল্লু স্বরাজ্যমের স্বামীর সাথে তার কিছু সমস্যা ছিল। ভেঙ্কট নরসীমা রেড্ডি তাকে ভাল আচরণ করার জন্য বললো। এরপরও যখন সে তার আচরণের কোন পরিবর্তন করলো না, তখন স্বরাজ্যমের তার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। স্কোয়াডের সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল। এসব ক্ষেত্রে আমরা মহিলাদের পক্ষ নিতাম। যখন তাদের মধ্যে মিলিতভাবে চলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতো, কেবল তখনই আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলতাম। স্কোয়াডগুলির নিজেদের মধ্যেও সমস্যা ছিল, বিশেষ করে গ্রাম্য বিরোধকে নিয়ে। কাজেই এসমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য আমাকে দূরের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যেতে হতো।

১৯৪৯ সালের আগে পর্যন্ত কমরেডদের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন ওঠেনি। ১৯৫১ সালের পর এই প্রশ্ন উঠলো। সেই সময় আত্ম গোপনকারী কমরেড এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের সুরক্ষা দেবার বিষয়টি নিয়ে আমাদের উপায় অনুসন্ধান শুরু হলো। এমন কি পুলিশী সন্ত্রাসের সময়ও পুনর্বাসনের বিষয়টি আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল না। কোঠাগুদেমে কোন্ডাল রেড্ডি নিজে তার ছোট স্কোয়াড নিয়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় দুই তিন দিনের আমার সাথে ছিল। সেখান থেকে আমি ও আমার সংবাদবাহক আমাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু করলাম। রেডিও এবং ক্যানভাস ব্যাগ রাস্তাসহ আমার মালপত্র অত্যন্ত ভারী ছিল। কিছুদূর যাবার পর হাল্কা বোঝাবহনকারী আমার সংবাদবাহককে আমাকে একটু সাহায্য করতে বললাম। সে পালটা প্রশ্ন করে বললো, " আমি কেন বহন করবো? কোন্ডাল রেড্ডি কোন এটা বইতে পারবে না? আমি তাকে বললাম কোন্ডাল রেড্ডি এমনি ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার উপর আমার বোঝা বইবার কথা তাকে আর বলতে পারি না। পরে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তোমাদের দুজনের কাউকেই আমার বোঝা বইবার কথা বলবো না। আমার বোঝা আমি নিজেই বয়ে নিয়ে যাবো।"

কয়েক মাইল হাঁটার পর কোন্ডাল রেড্ডি আমার বোঝার একটা অংশ

নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। আমি রাজি হলাম না। কারণ তার দু-হাত মালপত্রে এমনিতেই ভর্তি। আমি বললাম, একজন স্কোয়াড নেতাকে আমার মালপত্র বয়ে নেবার কথা বলা সঠিক নয়। নেতাকে যাত্রাপথে সাহায্য করার দায়িত্ব হচ্ছে সংবাদবাহকের। আমি সংবাদবাহককে এই বলে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম যে, নেতারা কাজ করার জন্য একমাত্র কর্মীদের উপরই নির্ভর করে না। আমাদের সংগ্রাম এ পর্যায়ে পৌঁছেনি যে নেতার আদেশ অমান্যকারী কর্মীকে সেই সময়েই গুলি করে মেরে ফেলা হবে। কমরেডরা নির্দেশের পরিবর্তে স্বত:স্ফূর্তভাবে নেতার আদেশ মেনে চলতো। রেড্ডি তার আদেশ অমান্য করার জন্য সংবাদবাহকের উপর শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত ব্যবস্থা নিতে পারতো। কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত থাকায়, সে ঐ কর্মীকে ধমক দিতেও ভয় পেয়েছিল। বাস্তবে ঐ সংবাদবাহক রাজি রেড্ডি স্কোয়াডের সদস্য ছিল, তাই সে কোন্ডাল রেড্ডির আদেশ মান্য করেনি।

আরো কয়েক মাইল যাবার পর সংবাদবাহক তার আগের উত্তেজিত ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। গুরুতর অন্যায় করেছে বলে ক্ষমা চাইতে লাগলো। সে বললো বাকি পথটা একাই আমার মালপত্র বহন করবে। আমি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম। আমার মালপত্র আমি অন্য কাউকে বহন করতে দেবো না। তাকে বললাম, সে কি ভেবেছিল যে আমি এই ভারি ভারি মালপত্র বইতে পারবো না, কিন্তু যখন বইতেই পারছি, তখন কারো হাতে আর দেবো না। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই আমি তাকে আমার মালপত্র বহন করতে দিলাম না। আমি তার মনে একটা দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করতে চেয়েছিলাম এইভাবে যে, যখন সে নিজের হাল্কা মালপত্র থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত বোঝা বইতে অনিচ্ছুক, তখন সে কিভাবে কোণ্ডাল রেড্ডিকে অতিরিক্ত মালপত্র বইবার কথা বলে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, যখন তাকে প্রথমবার মালপত্র বহন করার কথা বলেছিলাম তখনই সেই অতিরিক্ত বোঝা বহন করার মতো সমর্থ ছিল। সে একজন জমিদারের মতো করে হাঁটতে চেয়েছিল। তার এই আচরণ আমাকে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করে তুলে এবং কোণ্ডাল রেড্ডিকে বোঝাটা দেবার মতো দুর্বিনীত ব্যবহারের

জন্য তাকে তার উপযুক্ত একটা উত্তর দিতে চেয়েছিলাম। এধরনের উদাহরণ বিপথগামী কর্মীদের উপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছার পর কোন্ডাল রেড্ডি তার নিজের জায়গায় ফিরে গেলো। সে সমস্ত ঘটনার কথা তার স্কোয়াডের সদস্যদের কাছে বর্ণনা করলো। সেই সংবাদবাহক ও ফিরে এলো। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম, রামচন্দ্র রেড্ডি ও অন্যান্যদের পেয়ে গেলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের আগে অনেক কমরেডের পরিবারের সদস্যরাও স্কোয়াডের সাথে ছিল। রামচন্দ্র রেড্ডির স্ত্রী সুশীলাও একজন সক্রিয় কর্মীর মতো কাজ করতো। তারা দুজনেই সাধারণ ঘর থেকে এসেছে। মনে হয় সুশীলা পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতি সম্প্রতি রেড্ডি মারা গেছে। আমি তাদের স্কোয়াডে সাথে দুই তিন দিন থাকলাম। একদিন দেখলাম সে গরুর গাড়িতে প্রচুর মালপত্র নিয়ে চলেছে। তাকে বললাম এ ধরনের কাজ বিপজ্জনক, কারণ নিজামের পুলিশ যানবাহনের সাহায্যে মালপত্র বহনের উপর নজর রাখছে। বিশেষ কারণে তাকে নিজে গাড়ী চালিয়ে নিতে বললাম। তাকে আরো বললাম যাতে স্কোয়াডের মধ্যে এত বিরাট সংখ্যায় পরিবারের লোকজন না রাখে, বিশেষ করে স্ত্রীদের। অভিযানের সময় ধরা পড়লে সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের হাতে তাদের শ্লীলতাহানির সম্ভাবনা আছে। তাদের স্ত্রীরা যদি গ্রামে থাকে তবে প্রয়োজনে তাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যায় । নেতাদের স্ত্রীরা সাথে সাথে থাকলে কর্মীরা ও উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে তাকে সাবধান হতে বললাম। কিছুদিন পর খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রামচন্দ্র রেড্ডি গ্রেপ্তার হয়ে যায়।

এস ভি কে প্রসাদ ও একইভাবে গ্রেপ্তার হয়। তখন সে বিয়ে করেনি। সে জঙ্গলে একটা সুরক্ষা স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আমি সেখানে গেলাম এবং তার স্কোয়াডের সাথে কথা বললাম। সেখান থেকে আমি গেলাম ভোঙ্গিরে। ভোঙ্গিরে আমার থাকা অবস্থায় কিছুদিন বাদেই খবর পেলাম যে অন্তর্ঘাতের কারণে প্রসাদ ধরা পড়েছে। সে স্থানীয় একজনকে স্কোয়াডের জন্য রেশন আনতে পাঠিয়েছিল। গ্রামের খবরী তাকে অনুসরণ করে এবং

পুলিশকে জানিয়ে দেয়। পুলিশ জঙ্গল ঘেরাও করে ফেলে। প্রসাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়ার আর কোন পথ ছিল না। অবশ্য আত্মসমর্পণের আগে গুলি বিনিময় হয়ে থাকতে পারে। তাকে হায়দ্রাবাদ সি আই ডি হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেখানে সশস্ত্র স্কোয়াড সম্পর্কে জানার জন্য তার উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক, সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের সামান্যই জানা থাকতো। এমন কি বীনের খোসা চাড়ানোর মতো জুলুম করেও পুলিশ বেশি কিছু জানতে পারতো না। এধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অভ্যুত্থানের গোটা সময়টা আমাদের সাহায্য করেছিল। এমন অনেকবারই হয়েছে যে নেতৃস্থানীয় কমরেডরা পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু কিছুই প্রকাশ করেনি। কোন কোন সময় অত্যাচারের মাধ্যমে পুলিশ কমরেডদের মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। কিন্তু পরবর্তী পুলিশী অভিযানে সামান্য কয়েকজনকেই ধরতে পেরেছে। কমরেডদের পক্ষে জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যাওয়া যুব সহজ ছিল। এভাবেই স্কোয়াডগুলির খুব সামান্য ক্ষতি হতো।

ভোঙ্গির থেকে আমি রামান্নপেটা স্কোয়াডের সাথে যোগাযোগ করলাম। এই এলাকার কমান্ডার ছিল নান্দিয়ালা শ্রীনিবাস রেড্ডি। পদ্ধতি সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা সে বুঝতে পারলো। কিন্তু যেভাবে আমি ঘুরে ঘুরে স্কোয়াডগুলির সাথে মিটিং করছি তা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে আমাকে সতর্ক করলো। সে বললো, যদি আমি এভাবে প্রতিনিয়ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে থাকি তবে পুলিশের পক্ষে আমাকে ধরার সম্ভাবনা থেকে যায়। অবশ্য তার স্কোয়াড সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা সে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে সে খুব উদ্বিগ্ন ছিল। আমি তাকে বললাম, স্কোয়াডগুলিকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখাকে অবহেলা করে যদি আমি শুধু আমার নিরাপত্তা নিয়েই ভাবি, তবে এই আন্দোলনের আমি নেতৃত্ব দেবো কিভাবে। তাকে নিশ্চিন্ত করে বললাম, আমার নিরাপত্তা বিষয়ে সমস্ত রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাকে বললাম যেখানে সশস্ত্র স্কোয়াডগুলি শত্রুবাহিনী থেকে প্রতিনিয়ত আক্রমণের মুখে রয়েছে, সেখানে

একটু ঝুঁকি নিলে তেমন বড় কিছু হবে না। আমার নিরাপত্তা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে তাকে নিষেধ করলাম। কারণ আমি বিভিন্ন পর্যায়ে বাহক পরিবর্তন করে করে খুব দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই। যদিও যোগাযোগ রক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন, তবু স্কোয়াডগুলির সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের পরামর্শ দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেখনে আরুট্‌লা রামচন্দ্র রেড্ডি এবং আরুট্‌লা কমলাদেবীর সাথে সাক্ষাৎ হলো। এই দম্পতির এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং তারা ছিলেন অতি পরিশ্রমী। যা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করলো তা হচ্ছে সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করার ধরন। ক্রীতদাস হিসাবে জমিদারের প্রতি যে ধরনের ঘৃণা থাকার কথা, সে জায়গায় দুর্বলতর অংশের মানুষেরা আরুট্‌লা এবং তার স্ত্রীর প্রতি দারুণ ভালবাসা পোষণ করতো। হরিজনদের সাথে একত্রে বসে আপেলের কাষ্ঠার্ড যাওয়ার কথা আমার মনে পড়ছে।

একদিন কমলা আমাকে জানালো যে তার এক আত্মীয় দুই একদিনের মধ্যে তার দুই বছরের সন্তানকে জঙ্গলে নিয়ে আসবে। তার কটি সন্তান আছে তা আমি জানতে চাইনি। তবে সন্তানকে দূরে সরিয়ে রেখে এভাবে আন্দোলনের জন্য কাজ করার জন্য তার প্রশংসা করলাম। আমি তাকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বললাম, কারণ খবরীরা তার আত্মীয়দের জঙ্গলে অনুসরণ করতে পারে। বললাম সন্তানকে বছর দুই বাদে দেখার মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। সন্তানকে দেখার পর তাড়াতাড়ি আত্মীয়দের সরিয়ে দেয়া হলো এবং মহিলা আবার সংগ্রামের কাজে ডুবে গেলেন। সেখান থেকে আমি রামচন্দ্র রেড্ডি এবং পদ্মী রেড্ডির নেতৃত্বাধীন স্কোয়াডের সাথে দেখা করতে গেলাম। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর হাতে দুজনেই মারা যায়। আমি বিবিনগরের কাছাকাছি (ভোঙ্গির এবং ঘাট কেশরের মাঝামাঝি) ব্রাহ্মণপল্লীতে অবস্থিত কোদত্তরামী রেড্ডির স্কোয়াডের সাথেও দেখা করি। সেখান থেকে কোদত্তরামী রেড্ডি আরেকজন বাহককে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে আমার সাথী করে আমাকে হায়দ্রাবাদ পাঠিয়ে দেন। তিনি গোটা অঞ্চলে

অত্যন্ত সম্মানীয় এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা তাকে আদর করে পেড্ডান্না বলে ডাকতো। যখন পশ্চাদ অপসরণের সমস্যা দেখা দিল তখন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে মাত্র তিনবার কৃষ্ণমূর্তির সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়েছি। মুথুকুবের যুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমার মনে পড়ছে।

জানাগাঁও এর কাছাকাছি গোপন আস্তানায় আমি প্রথমবারের মতো রবি নারায়ণ রেড্ডি এবং বাড্ডাম ইয়েলা রেড্ডির সাথেও সাক্ষাৎকারে মিলিত হই। ওয়ারাঙ্গল এবং করিমনগর এই উভয় এলাকার দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল রবি নারায়ণ রেড্ডির উপর। ইয়েলা রেড্ডি জানাগাঁও এলাকার কমান্ডার ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করার সাথে সাথে তারা পালিয়ে গেলো এবং তাদের মূল শিবিরগুলিকে প্রথমে বেঙ্গালোর ও পরে অন্য দূরবর্তী জায়গাতে সরিয়ে নিলো। অবশ্য ইয়েলা রেড্ডি গ্রামেই ধরা পড়ে। রবি নারায়ণ রেড্ডি হায়দ্রাবাদে চলে এলো। বাস্তবে যখন কেন্দ্রীয় বাহিনী অত্যাচার তীব্র করে তুললো, সেই সময় আমাদের গুপ্ত যন্ত্রপাতিগুলি শহরের কোন একটা গোপন আস্তানায় লুকিয়ে রাখলাম। যদিও এর আগে নিজামের পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তবুও আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হই। কিন্তু অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো যখন সরকার আরো বেশি সংখ্যক সৈন্য অভিযানে নিয়োগ করলো।

এই সময়ে আমি হায়দ্রাবাদে চলে এসেছি। পার্টি কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিল মহেন্দ্র। রাজ বাহাদুর গৌড়ও সেখানে ছিল, তবে অন্য জায়গায়। শহরের উপকণ্ঠে কারখানার কিছু শ্রমিক এবং রেলওয়ে কর্মচারীদের বাড়িতে আমাদের শিবির ছিল। যাহোক, মূল আস্তানা ছিল মহেন্দ্রের বাড়ি। তার স্ত্রীও আত্মগোপনে ছিল। রাজ বাহাদুর এবং বৃক্ষরাণীর মধ্যে তখনও বিবাহ সম্বন্ধ হয়নি। প্রথম দিক বৃক্ষরাণী আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। রঙ্গাচারী নামে এক শিল্পী ছিল। সে ছিল আন্দোলনের কাজে অত্যন্ত সক্রিয়। কামা রেড্ডির আরো একজন কমরেড ছিল যাকে আমরা পুরুষোত্তম বলে ডাকতাম। রঙ্গাচারী ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হয় এবং তাকে জেলে পোরা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে জেল থেকে বের করে হুজুরনগরে রাজি রেড্ডির সাথে

গুলি করে মেরে ফেলা হয়। কমরেডরা জেলে, কোর্টে কিংবা জামিন পেয়ে বাইরেই থাকুক তাদের মেরে ফেলা সেই সময়ে একটা মামুলি কাজ ছিল। যে অল্প সময় আমি শহরে ছিলাম, সেই সময়টাতে কম্যুনিস্ট এবং তাদের দরদীদের বেধড়ক গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। হায়দ্রাবাদে যাবার পথে আমি কমরেড রাজান্নার, যাকে আমরা ভেঙ্কট নরসীমা রেড্ডি বলে ডাকতাম, তার সাথে সাক্ষাৎ করি। সে ভোঙ্গির স্কোয়াডের সাথে যুক্ত ছিল। যদিও সে একটি মাঝারি কৃষক পরিবার থেকে এসেছিল, তবুও আত্মগোপনে থাকা সদস্যদের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সে কঠোর শৃঙ্খলা পরায়ণ ছিল। সাধারণ জনগণের সাথে মেলামেশা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

আমি মহেন্দ্রের নেতৃত্বে থাকা আস্তানাতেই থাকতাম। সাধারণত বাইরে থেকেই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আস্তানাগুলির সাথে যোগাযোগ করা যেতো। কেউ সরাসরি ভেতরে যেতে পারতো না। একমাত্র এগুলি যারা দেখাশোনা করতো এবং যারা দায়িত্বে ছিল, শুধু তারাই বাইরে যেতে পারতো এবং নেতাদের বিভিন্ন পথ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে ভেতরে নিয়ে আসতো। একবার আস্তানার ভেতরে ঢুকলে, বলতে গেলে, বাইরের জগতের সাথে কোন যোগাযোগই থাকতো না। এই আস্তানাগুলির টিকে থাকা সম্পূর্ণভাবে এগুলিকে যারা দেখাশোনা করতো এবং যারা সম্পূর্ণভাবে এগুলিকে যারা দেখাশোনা করতো এবং যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করতো। কোন সময় কোন সংবাদবাহককে ধরে পুলিশ পাশবিক অত্যাচার করলেও যাতে এই আস্তানাগুলির হদিশ না পায়, সেজন্য আমরা পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য ঢিলেঢালা সংবাদবহন পদ্ধতি অনুসরণ করতাম। যখন আমরা এ ধরনের ব্যবস্থা করে চলেছি এবং বর্তমান সংগ্রামকে আরো এগিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সদস্যদের কাছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে চলেছি, সেই সময় হায়দ্রাবাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে থাকা উচিত বলে রাজ বাহাদুর গৌড়ের রাজনৈতিক বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো

নেমে এলো। আমরা সাথে সাথে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করলাম। কারণ এধরনের বক্তব্য আমাদের লড়াই এর উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আমরা সমস্ত কমরেডদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলায় গৌড়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করলাম। কারণ এধরনের বক্তব্য আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আমরা সমস্ত কমরেডদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার গৌড়ের বক্তব্যের সাথে পার্টির কোন সম্পর্ক নেই, এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব, একথাগুলি সমস্ত স্কোয়াডের কাছে পৌঁছে দিতে কোন সমস্যা হয়নি।

মহেন্দ্র এবং তার পরিবার সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমরেডদের কাছে অত্যন্ত সহায়ক ছিল। পরে তার বাড়ি ছেড়ে বিজয়ওয়াড়াতে স্থান পরিবর্তন করলে ও অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের প্রশ্নে মহেন্দ্রের বাড়িটাই হায়দ্রাবাদ শহরের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বর্তমান সময়ে যে রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকুক না কেন, কমরেডরা তাদের জীবন বাজি রেখে সংগ্রামের জন্য কাজ করেছে। অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সময়ে আমরা জানতে পারলাম যে, কোডাত্তারামী রেড্ডিকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। সে চারদিক থেকে ঘেরাও এর মধ্যে গিয়ে ধরা পড়ে এবং শেষে তাকে গুলি করে মারা হয়। মুসী নদী পার হবার সময় থিরুমালা রেড্ডির নেতৃত্বে থাকা কিছু স্কোয়াড সদস্য প্রাণ হারায়। পদ্ম রেড্ডির স্কোয়াডও ঘেরাও এর মধ্যে পড়ে গুলি বিনিময় চলাকালীন মারা যায়। বেশির ভাগ স্কোয়াডই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন কি যে সমস্ত সদস্য গুলি বিনিময়ে আহত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের ও পুলিশ মেরে ফেলে। শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুলিশ কেইস করে এবং কমরেডদের কোর্টে চালান দেয়। যে সমস্ত কমরেডদের কাছে অস্ত্র ছিল, তারা জীবনের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া লড়াইয়ে বিরতি দেবার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন পত্রপত্রিকার খবর ছিল ভিন্ন ধরনের। পুলিশের হাতে ধরা পড়া আরো বেশি খারাপ। সরকারি দলিলপত্রে দেখা গেছে কিভাবে কমরেডরা ধরা পড়েছিল এবং

ধরাপড়া অবস্থায় পুলিশ তাদের উপর কি ধরনের নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। এভাবে একটার পর একটা ঘটনা যখন ঘটছিলো, তখনও আমরা হায়দ্রাবাদেই রয়েছি। তাই আমরা সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য রাজ্য কমিটির মিটিং করতে চাইলাম। এই কারণেই আমি ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে বিজয়ওয়াড়া চলে এলাম। কিন্তু যে সময়ে আমি সেখানে পৌঁছলাম ততক্ষণে বেশিরভাগ গ্রেপ্তারির কাজই শেষ। মিটিং এর আলোচ্য বিষয় ছিল, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া না থামিয়ে দেয়া। পাশাপাশি যদি সংগ্রাম থামিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে সেই খবর পৌঁছে দেবার জন্য স্কোয়াডগুলির সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

যখন রাজ্য কমিটির সভা চলছিলো সে সময়ে আমি টাইফয়েডে আক্রান্ত হই। ড: রাজা রাও আমরা চিকিৎসা করেন। অল্প কিছুদিনের জন্য আমরা আমাদের হেডকোয়ার্টার্স বিজয়ওয়াড়ি থেকে রাজামুন্দ্রীতে সরিয়ে নেই। আমরা রাজামুন্দ্রী থেকে বাইজাগ এবং পরে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়লাম। রাজ্য কমিটিও গুপ্ত অবস্থায় ছিল। বিজয়ওয়াড়াতে সরে যাবার আগেই আমরা রাজ্য কমিটির সভা করি। ১৯৪৯ এর মার্চের পার্টি দলিলও চূড়ান্ত করলাম। রাজেশ্বর রাও, বাসবপুন্নাইয়াসহ সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমরেডরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যদিও সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবার আগেই এঁরা পলিট ব্যুরোর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হলেও, তাঁরা পার্টির কে থাকতেন না। সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য তাঁরা ফিরে আসেন। ১৯৫০ সালে কেবল তাঁরা কেন্দ্রে ফিরে যান। ১৯৪৮ সালে যখন পুলিশী অভিযান শুরু হলো তখন আমরা সেখান থেকে সরে আসি।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি কংগ্রেস শেষ হবার পর, সংগ্রামকে পরিচালনা করার জন্য এঁরা সবাই এখানেই ছিলেন। একজন সমর্থকের বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে কৃষ্ণা জেলার বুথুমিল্লীপদুতে কমরেড চন্দ্রম গ্রেপ্তার হয় একটা খবরের আভাস্ পেয়ে পুলিশ গ্রামে অভিযান চালায়। পালাবার কোন পথই ছিল না। যদি তখনও

সেই সমর্থকের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতো, তবে পুলিশ পরিবারের সমস্ত সদস্যদের উপরই অত্যাচার নামিয়ে আনতো। তাই তিনি ঐ বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় চলে এলেন এবং সেখানেই ধরা পড়লেন। পুলিশকে বললেন যে, তিনি শুধুমাত্র গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশ জানতো যে, তিনি এই গ্রামেরই কোন বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই বাড়িতে ধরতে পারেনি। যদি তা হতো তবে আশ্রয়দাতার ভাগ্যে অবর্ণনীয় দুঃখ নেমে আসতো। এভাবেই পুলিশের হাত থেকে সমর্থকদের রক্ষা করার জন্য নেতৃস্থানীয় কমরেডরা ভূমিকা নিয়েছিলেন। নেতারা এধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনগণকে প্রভাবিত করেছিলেন। চন্দ্রম প্রচন্ড সাহসের পরিচয় দিয়ে পুলিশের দেয়া শর্ত মেনে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে এর চেয়ে বরং এদের হাতে মৃত্যুবরণই শ্রেয় বলে মনে করলেন। সেই সময় অন্ধ্র এলাকায় দেখা মাত্রই গুলি করার নির্দেশ ছিল না। তাঁকে একজন রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে জেলে নেয়া হতো। একমাত্র তাঁর মা অথবা বাবার শেষকৃত্যে যোগদান করার জন্য ১৯৫০ সালে তিনি প্যারোলে বেরিয়ে এলেন। তারপর আবার আত্মগোপনে চলে গেলেন।